প্রাচীন ন্যায় মত অনুসরণে প্রমাণের প্রামাণ্য বিচার

পাপিয়া গুপ্ত

সারসংক্ষেপ: ভারতীয় দর্শনে প্রসিদ্ধ ষড় আস্তিক দর্শনের অন্যতম ন্যায়দর্শনের স্বাতন্□্য তার চিন্তনের স্বকীয়তায়। সাধারণভাবে 'ন্যায়' শব্দটির দ্বারা যুক্তি বা হেতুকে বোঝালেও ন্যায়সম্প্রদায় প্রমাণ প্রয়োগের মাধ্যমে বিষয়ের পরীক্ষা বা বিচারকেই 'ন্যায়' বলেছেন এবং এই নিবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়, যে প্রমাণের দ্বারা যাবতীয় বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যে প্রমাণ 'সর্বাপেক্ষা অধিক' প্রয়োজন বিশিষ্ট রূপে ন্যায়স্বীকৃত ষোড়শ পদার্থের সর্বাগ্রে উল্লিখিত হয়েছে, সেই প্রমাণের প্রামাণ্য পরীক্ষা তথা প্রতিষ্ঠা।

বীজশব্দ: ন্যায়, প্রমাণ, ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি, সর্বপ্রমাণ প্রতিষেধ।

মহর্ষি গৌতম রচিত 'ন্যায়সূত্র' ন্যায়দর্শনের আকর গ্রন্থ এবং ঐ সূত্রের ওপর বাৎস্যায়ন ভাষ্য রচনা করেছেন প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে মহর্ষি গৌতম কিন্তু এই ন্যায়শাস্□্র স্রষ্টা নন, বক্তামাত্র কারণ তার পূর্বেও এই শাস্□্র অস্তিত্ব ছিল। ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থের প্রারম্ভে জয়ন্ত সৃষ্টির প্রথম অবস্থা থেকেই সংক্ষিপ্ত আকারে ন্যায়শাস্□ ছিল। বেদকে প্রামাণ্যরূপে স্বীকার করায় ন্যায়দর্শন আস্তিক দর্শন নামে পরিচিত হলেও এর স্বাতন্□্য হল স্বকীয় স্বাধীন চিন্তার, আবার এই শাস্□ তর্কসহ বিচার প্রধান হওয়ায় তা তর্কশাস্□ বা বিচার শাস্□রূপেও সমধিক প্রসিদ্ধ। সাধারণ অর্থে ন্যায় শব্দের দ্বারা যুক্তি বা হেতুকে বোঝায় — ন্যায়ভাষ্যে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে —"প্রমাণৈরর্থং পরীক্ষণং ন্যায়ঃ" অর্থাৎ প্রমাণ প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থ বা বিষয়ের যে পরীক্ষা বা বিচার তাই ন্যায়। মীমাংসা, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় এই অর্থেই 'ন্যায়' শব্দের প্রয়োগ করেছে অর্থাৎ উল্লিখিত শাস্□গুলিতেও প্রমাণের প্রয়োগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষা করা হয়েছে। অন্যান্য আস্তিক দর্শনের ন্যায় মোক্ষ বা অপবর্গ বা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি-ই ন্যায়শাস্□্র মূল উদ্দেশ্য এবং তার উপায় নির্ধারণ প্রসঙ্গে মহর্ষি গৌতম বলেছেন,

> "প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতন্ডা-
> হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ"।।[১]

অর্থাৎ প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই সাক্ষাৎভাবে বা পরম্পরায় মুক্তির কারণ, যার প্রথমটি প্রমাণ। প্রমাণের মাধ্যমেই যাবতীয় বিষয়ের প্রতিপত্তি বা সিদ্ধি হয় অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারাই কোন বিষয়টি গ্রহণযোগ্য এবং কোন বিষয়টিই বা ত্যাজ্য সেই বোধ হয় এবং ব্যক্তির ঐ সংশ্লিষ্ট বিষয়টি গ্রহণ বা ত্যাগ করার যে ইচ্ছে বা প্রবৃত্তি তা সফল হয়। এমনকি ন্যায়দর্শনের প্রথমেই দেখা যায় পদার্থকে এই বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে যা প্রমাণসিদ্ধ তাই পদার্থ — এই পদার্থ ভাব ও অভাব ভেদে দ্বিবিধ হওয়ায় প্রমাণের মাধ্যমে যাকে ভাব পদার্থ রূপে জানা যায় তাই ভাব পদার্থ এবং যাকে অভাব পদার্থ রূপে জানা যায় তাই অভাব পদার্থ। কিন্তু প্রমাণের প্রামাণ্য কি নিঃসন্দিগ্ধ ? এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় প্রাচীন ন্যায় দর্শনে আলোচিত প্রমাণের প্রামাণ্য বিষয়। আলোচনার গভীরে প্রবেশের পূর্বে প্রমা / প্রমাণ বিষয়ে সামান্য আলোচনা প্রয়োজন প্রেক্ষিতটি স্পষ্ট করার জন্যে।

'প্রমাণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্র +মা +অনট প্রত্যয়। 'প্রমীয়তে অনেন' এরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা প্রমাণ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ প্রমা করণত্বই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ। প্রকর্ষবাচক 'প্র' উপসর্গের দ্বারা প্রকৃষ্ট অর্থ এই বোধ হয় এবং 'মা' ধাতুর অর্থ জ্ঞান এবং 'মা' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে অনট্ প্রত্যয় করায় 'প্র-মা' শব্দের দ্বারা প্রকৃষ্ট জ্ঞানই বোধ্য এবং প্রকৃষ্ট জ্ঞান হল যথার্থ জ্ঞান। অতএব 'প্রমাণ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হবে যথার্থ অনুভূতির করণত্ব। সরলভাবে বলা যেতে পারে — 'ক' যদি 'খ' বিষয়ে যথার্থ অনুভূতির

করণ হয় তাহলে 'ক' 'খ' এর প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হবে। প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয় যে যথার্থ অনুভূতির কারণ কিন্তু প্রমাণরূপে গণ্য নয় কারণ সেক্ষেত্রে প্রমাতা, প্রমেয় — তে প্রমাণ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়ে যাবে। কারণ প্রমাতা, প্রমেয়াদিও যথার্থ অনুভূতির কারণ। কিন্তু বস্তুতঃ প্রমাণ যে প্রমেয়, প্রমাতা থেকে ভিন্ন এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। অতএব যথার্থ অনুভূতির করণই প্রমাণরূপে গণ্য। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রমাণের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন —

"উপলব্ধিসাধনানি প্রমাণানীতি সমাখ্যানির্বচনসামর্থ্যাদ্ বোদ্ধব্যম্।

প্রমীয়তে' নেনেতি করণার্থভিধানো হি প্রমাণশব্দঃ।"[২]

অর্থাৎ উপলব্ধির সাধনসমূহ যে প্রমাণ তা 'প্রমাণ' শব্দের নিষ্পাদক ধাতু ও প্রত্যয়ের শক্তিবশতঃ বোঝা যায়। কারণ ব্যাখ্যা করে বলা যায় — 'প্রমীয়তেহনেন' বা এটির দ্বারা পদার্থ প্রমিত হয়, এই ব্যুৎপত্তিবশতঃ 'প্রমাণ' শব্দটি করণার্থবোধক অর্থাৎ তার অর্থ প্রমাজ্ঞানের করণ।

প্রমাণ আলোচনার প্রেক্ষিতে আরো দুটি বিষয় গুরুত্বের দাবী রাখে — উপলব্ধির কর্ত্তা অর্থাৎ প্রমাতা এবং উপলব্ধির বিষয় প্রমেয়। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এরা যদিও উপলব্ধির কারণস্বরূপ কিন্তু যেহেতু করণ নয় তাই প্রমাণও নয়। ব্যাখ্যা করে বলা যায়, যা উপস্থিত হলে পরক্ষণে অবশ্যই কার্য্য জন্মায়, তাকেই সেই কার্য্যের সাধকতম রূপে মুখ্য করণ বলা হয়ে থাকে এবং প্রমাতা ও প্রমেয় সেই উপলব্ধির সাধকতম না হওয়ায় প্রমাণ হয় না। আরো স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে একথা অনস্বীকার্য্য যে প্রমাতা ও প্রমেয় উপস্থিত থাকলে কার্য্য জন্মায় না কিন্তু প্রমাতা উপস্থিত থাকলেই যে সর্বদা কার্য্য উৎপন্ন হয় — এমনটিও বলা যায় না কিন্তু প্রমাণ বিদ্যমান আছে অথচ প্রমিতি হয়নি এমন কখনো ঘটে না — অতএব প্রমাণ প্রমিতির পক্ষে সাধকতম।

কিন্তু আশংকা হতে পারে প্রমাণের প্রামাণ্য বিষয়ে আদৌ কি প্রমাণ স্বীকারযোগ্য ? কোন কোন সংশয়বাদী ও শূণ্যবাদী দার্শনিক সম্প্রদায় মনে করেন প্রমাণ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান কোনভাবেই সম্ভব নয় এবং তদনুসারে প্রমাণের দ্বারা অন্য পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের কথাও আর কল্পনা করা যায় না। সংশয়বাদীগণের যুক্তি অনুসারে যথার্থ অনুভূতির সাধন-ই হল প্রমাণ। কিন্তু কোন বিষয়ে অনুভূতি জন্মালে সেই অনুভূতি যথার্থ কিনা সেই নিশ্চয়তার উপায় নেই কেননা প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় অসম্ভব। এই যুক্তি সিদ্ধ হলে ন্যায়শাস্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায় তাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উপরোক্ত যুক্তিটি খণ্ডন করে বলেছেন, প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চিতভাবে অসম্ভব নয় — অনুমান প্রমাণের দ্বারাই প্রমাণ সাধিত হয়।

"প্রমাণতোহর্থ-প্রতিপত্তৌ

প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং।"[৩]

অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা অর্থ বা বিষয়ের প্রতিপত্তি বা বোধ হলে প্রবৃত্তি সফল হয়। তাৎপর্য্য এই যে প্রমাণ যেহেতু সফল প্রবৃত্তির জনক অতএব প্রমাণ অর্থবৎ। ভাষ্যকারের মতে মূলতঃ অনুমান প্রমাণের দ্বারাই প্রামাণকে অর্থবিশিষ্টরূপে গ্রহণ করা হয়। বিষয়টি সামান্য ব্যাখ্যা করে বলা যায় 'অর্থবৎ' এই শব্দের অর্থ হল অর্থের অব্যভিচারিতা। যে পদার্থ যেরূপ ধর্মাবিশিষ্ট তাকে সেরূপ ধর্মবিশিষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করাই হল অব্যভিচারিত্ব। অতএব 'প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারি' বা 'প্রমাণ অর্থবৎ' — এ কথাটির অর্থ হল, প্রমাণ যে পদার্থটিকে যেরূপ ধর্মবিশিষ্টরূপে প্রতিপাদিত করে, সেই পদার্থটি সেরূপ ধর্মাবিশিষ্টই হয়, কখনো তার ব্যতিক্রম হয় না। অতএব, একথা বলা যায় যে, প্রমাণের দ্বারা কোন বিষয়ের যথার্থবোধ হলে সেই বিষয়ে সফল প্রবৃত্তি জন্মায় এবং প্রমাণ সফল প্রবৃত্তির জনকরূপে অর্থবৎ। টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র 'প্রমাণংঅর্থবৎ' — এই বাক্যের ভিত্তিতেই প্রমাণকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন বিশিষ্টরূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁর মতানুসারে প্রমাণ অধিক প্রয়োজন বিশিষ্ট হওয়ার কারণেই মহর্ষি সর্বাগ্রে প্রমাণ পদার্থের উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু কোন বিষয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞানলাভের জন্য সেই বিষয়ে পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। 'পরি' শব্দের অর্থ হল সম্যকরূপে এবং

'ঈক্ষা' শব্দের অর্থ হল নির্ণয়, অর্থাৎ যে যুক্তি বা বিচারের মাধ্যমে সর্বতো ভাবে এই ঈক্ষা বা নির্ণয় জন্মায়, তাই হলো পরীক্ষা। পরীক্ষার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে অনুমান চিন্তামণিতে বলা হয়েছে — "সমারব্ধানুমানপ্রামাণ্য পরীক্ষা...।"[৪] এবং গাদাধরীতে বলা হয়েছে 'পরমতনিরাকরণ পূর্বক স্বমতব্যবস্থাপনম্ পরীক্ষা'অর্থাৎ পরীক্ষা হলো বিচারের মাধ্যমে অন্যের মতবাদ খণ্ডন করে নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন।

মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের পরীক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন — সর্বাগ্রে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের ক্রম অনুসারে প্রমাণ পদার্থেরই নির্দেশ থাকায় প্রথমে প্রমাণ পদার্থেরই পরীক্ষা উচিত হলেও মহর্ষির এই ক্রম মানেন নি। তিনি তৃতীয় পদার্থ সংশয়ের পরীক্ষা সর্বপ্রথম করেছেন। মহর্ষি এই সিদ্ধান্তের কারণ হল সংশয় ব্যতীত কোন পদার্থের পরীক্ষা প্রয়োজনীয় নয়। সরলভাবে বলা যায়, যে বিষয়ে কোন সংশয় নেই, সেই বিষয়ের পরীক্ষা অবান্তর। অর্থাৎ যে কোন পরীক্ষার পূর্বে সংশয় থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্যভাবে বলা যায়, সংশয় জন্য পদার্থের অবধারণরূপ যে নির্ণয় তাই পরীক্ষা। অতএব যেকোন পরীক্ষার পূর্বাঙ্গ সংশয় — যে সংশয়ের পরে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের দ্বারা পদার্থের অবধারণ নির্ণয় করা হয়। তবে উদ্দ্যোতকরের মত অনুসরণ করে একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন নির্ণয় মাত্রই সংশয় পূর্বক হবে —এমনটি নয়। যেমন, প্রত্যক্ষ, অনুমানাদির ক্ষেত্রে সংশয়রহিত নির্ণয় হয়ে থাকে আবার বাদ-বিচার ও শাস্ত্রেও সংশয় রহিত হয়ে থাকে কিন্তু বিচারমাত্রই যে সংশয় পূর্বক — এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। এমনকি শাস্ত্রাদিতেও যখন বিচার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, তখন তার পূর্বাঙ্গরূপে সংশয় অবশ্যই থাকে কারণ বিচারের অবতারণাই হয় সংশয়ের কারণে। অতএব 'পরীক্ষা' বলতে যদি বিচার বোঝা হয় তাহলে পরীক্ষামাত্রই সংশয়পূর্বক — এমন বলা যেতে পারে। ন্যায়কন্দলীতেও পরীক্ষাকেই বিচার বলা হয়েছে —

"ললিতস্য যথালক্ষণং বিচারঃ পরীক্ষা।"[৫]

মূল প্রসঙ্গে ফিরে বলা যায় মহর্ষি গৌতম প্রমাণ-পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ন্যায়দর্শনের সেই অতিপরিচিত আকর্ষক রীতিটি গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ স্বয়ং পূর্বপক্ষরূপে আশংকার অবতারণা করে, তাকে বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করে পরে সিদ্ধান্তীপক্ষরূপে ঐ আপত্তির সমাধানপূর্বক নিজ বক্তব্য স্থাপন। পূর্বপক্ষীয় মতটি উপস্থাপনের পূর্বে উল্লেখ করা আবশ্যক যে মহর্ষি কিন্তু প্রথমে প্রমাণের সামান্যলক্ষণ পরীক্ষা করেছেন যেহেতু বিশেষ লক্ষণ সর্বদাই সামান্য লক্ষণপূর্বক হওয়ায় সামান্য লক্ষণ না বোঝা গেলে বিশেষ লক্ষণ বোঝা সম্ভব নয়। এখন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রমার করণই প্রমাণ বা যথার্থ অনুভূতির সাধনত্বই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ এবং ন্যায়দর্শনে স্বীকৃত চর্তুবিধ প্রমাণ-প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ এই চারটির প্রতিটি স্থলেই প্রমাণের ঐ সামান্য লক্ষণটি প্রযোজ্য। প্রমাণের পরীক্ষা প্রসঙ্গে প্রথমেই যা প্রয়োজন তা হল প্রমাণের সম্ভাব্যতা প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রমাণ আদৌ আছে কি না সেটি-ই প্রথম পরীক্ষা করা আবশ্যক। এখানে সংশয়ের প্রসঙ্গ আসে যেহেতু সৎ ও অসৎ উভয় পদার্থের যে সমান ধর্ম্ম প্রমেয়ত্ব, তা প্রমাণে আছে এবং কোন বিশেষ দর্শন হচ্ছে না। অতএব সন্দেহের অবকাশ থাকে প্রমাণ সৎ অথবা অসৎ। অর্থাৎ প্রমাণের প্রামাণ্য বিষয়ে সংশয় দেখা যায়। এক্ষেত্রে পূর্বপক্ষীয় মতটি হল প্রমাণ বা প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নেই। পরবর্তীকালে তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এই মতটিকে শূণ্যবাদী বৌদ্ধ মাধ্যমিকের সিদ্ধান্ত রূপে অভিহিত করেছেন। যদনুসারে বলা যায়, যদিও প্রমাণ নামে কোন পদার্থ বস্তুতঃ নেই, লোকে কিছু বিষয়কে প্রমাণ রূপে অভিহিত করে কিন্তু সেগুলির কোনটিই বিচারসহ নয় এবং যেহেতু তা কোন কালেই কোন পদার্থকে প্রতিপাদন করে না তখন তাদেরকে প্রমাণ নামে অভিহিত করা যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহর্ষি বহু পূর্বেই মাধ্যমিকের এই বক্তব্যের আশংকা করে তাকে শক্তিশালী হেতু দ্বারা সমর্থন করে এবং পরে তা সর্বতোভাবে খণ্ডন করে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মহর্ষি গৌতম 'প্রমাণের প্রামাণ্য নেই' এই পূর্বপক্ষ প্রতিষ্ঠায় হেতু প্রদান করে বলেছেন,ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ অসম্ভব—

"প্রত্যক্ষাদীনাম প্রামাণ্যং ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ।।"[৬]

ত্রৈকাল্য বলতে বোঝায় পূর্বকাল, উত্তরকাল ও সমকাল — এই তিনকালের প্রত্যেকটিতে বর্ত্তমানতা এবং 'অসিদ্ধি' শব্দের অর্থ অভাব। অতএব 'ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি' প্রত্যয়টির অর্থ হল তিনকালে অভাব বা কলত্রয়বর্ত্তিতার অভাব। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন 'পূর্বাপর সহভাবের অনুপপত্তি'। ব্যাখ্যা করে বলা যায়, প্রমাণে প্রমেয়ের পূর্বভাব নেই অর্থাৎ প্রমাণ প্রমেয়ের পূর্বে থাকে না, প্রমাণে প্রমেয়ের সহভাব নেই অর্থাৎ প্রমাণ প্রমেয়ের সমকালে থাকে না এবং প্রমাণে প্রমেয়ের উত্তর ভাব বা অপরভাবও না থাকায় প্রমাণ প্রমেয়ের পরেও থাকে না। অতএব প্রমাণ কোন কালেই প্রমেয় সাধন করে না অতএব তার প্রামাণ্য কোনভাবেই স্বীকার্য্য নয়।

এইভাবে সামান্যত প্রমাণের অপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করে মহর্ষি এরপর ঐ সামান্য বাক্যটিকে বিশ্লেষণ পূর্বক পৃথক পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে কিভাবে প্রমাণে প্রমেয়ের পূর্বভাব, অপরভাব ও সহভাবের অনুপপত্তি হয়েছে। প্রথমতঃ প্রমাণ যদি প্রমেয়ের পূর্বে সিদ্ধ হয় তাহলে একথা আর বলা যাবে না যে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ হেতুক প্রত্যক্ষের উৎপত্তি হয় —

"পূ□র্বং হি প্রমাণসিদ্ধৌ নেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাৎ প্রত্যক্ষোৎপত্তিঃ।।"[৭]

বিষয়টিকে বিশদে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষের লক্ষণে বলা হয়েছে — "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানম্ ... প্রত্যক্ষম্।"[৮] অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গন্ধাদি বিষয়ের সঙ্গে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের কারণে ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। এখন যদি বলা হয়, গন্ধাদি প্রত্যক্ষের পরেই গন্ধাদি বিষয়ের সিদ্ধি হয় অর্থাৎ গন্ধাদি যে প্রমেয়, তার পূর্বেই যদি তার প্রত্যক্ষ হয়, তাহলে ঐ প্রত্যক্ষটিকে আর ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সাথে গন্ধাদি বিষয়ের সন্নিকর্ষগত কারণে জাত বলা যাবে না। কেননা যে গন্ধাদি বিষয়ের সাথে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হবে, সেই বিষয়টিই তো তার প্রত্যক্ষের পূর্বে নেই। অতএব ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষহেতুক প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় — এই লক্ষণটির সার্থকতা ব্যাহত হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষের লক্ষণটি অনস্বীকার্য্য। অতএব গন্ধাদি প্রত্যক্ষ হবার পূর্বেই গন্ধাদি বিষয় থাকে যার সাথে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হেতু গন্ধাদি প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় — এমনই বলতে হবে। অতএব প্রমাণে প্রমেয় বিষয়ের পূর্বকালবর্তীতা কখনোই সম্ভব নয়।

আরো কথা এই যে, যদি-গন্ধাদি বিষয়টি পূর্বে না থাকে তাহলে তার সাথে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না হওয়ার ঐ ইন্দ্রিয়কেও আর প্রমাণ বলা যাবে না, কারণ বিষয়ের সঙ্গে সন্নিকর্ষ হলে তবেই সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ বলা যাবে। অতএব প্রমাণ কোনভাবেই প্রমেয়ের পূর্ববর্তী হতে পারে না।

দ্বিতীয় কল্পে পূ□র্বপক্ষীয় আশংকা উল্লেখ করে মহর্ষি প্রমাণে প্রমেয়ের উত্তরকালীনত্বকেও অসিদ্ধরূপে বর্ণনা করেছে। অর্থাৎ প্রমাণ যেমন প্রমেয়ের পূর্বকালে থাকে না তেমনি তা পরবর্তীকালেও থাকতে পারে না যেহেতু সেক্ষেত্রে প্রমেয়সিদ্ধ-ই অসম্ভব হয়ে পড়ে —

"পশ্চা ৎ সিদ্ধৌ ন প্রমাণেভ্যঃ প্রমেয়-সিদ্ধিঃ"।।[৯]

বিশদ ব্যাখ্যায় বলা যায়, যদি প্রমেয়ের পরে প্রমাণ সিদ্ধি হয়, তাহলে তার অর্থ এরূপ স্বীকার করে নেওয়া যে প্রমেয়ের পূর্বে প্রমাণ নেই তাহলে প্রমেয় কিভাবে সিদ্ধ হবে ? কারণ প্রমেয় তো প্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ হয় বা অন্যভাবে বলা যায় প্রমাণ-ই প্রমেয়ের সাধক। অবশ্য এই আশংকার একটি প্রস্তাবিত সমাধান হতে পারে যে প্রমেয় বিষয়টি (প্রমেয়রূপে না হলেও) প্রমাণের পূর্বেই আছে যেহেতু তা প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। ঐ বিষয়টির প্রমাজ্ঞান বস্তুতঃ প্রমাণ নির্ভর — অতএব ঐ প্রমাজ্ঞানের পূর্বে প্রমাণ না থাকলে তার উৎপত্তি হতে পারে না — এ কথা যথার্থ। কিন্তু প্রমেয় বিষয়টির ক্ষেত্রে তা সত্য নয়। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যদিও স্বরূপতঃ প্রমেয়বস্তু প্রমাণের অধীন নয় কিন্তু তার প্রমেয়ত্ব প্রমাণের অধীন হওয়ায় সেই প্রমেয়ত্বর অস্তিত্ব যদি প্রমাণের পূর্বে থাকে, তাহলে তাকে আর প্রমাণের অধীন বলা যাবে না। অর্থাৎ প্রমেয়ত্ব-র অর্থই প্রমাজ্ঞান বিষয়ত্ব। আরো সরলভাবে বলা যায়,

কোন বস্তু প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হলে তবে তা প্রমেয়রূপে অভিহিত হয়। এখন যদি প্রমাণ পূর্বে না থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায় তা 'প্রমেয়' পদবাচ্য হবে না। উদ্দ্যোৎকরও এই বক্তব্যের সপক্ষে বলেছেন যে, প্রমাণ দ্বারাই বিষয় প্রমেয়রূপে স্বীকৃত হতে পারে। অতএব, প্রমাণ যদি প্রমেয়ের পরকালে থাকে তাহলে কোনভাবেই প্রমেয়সিদ্ধি সম্ভব নয়। ফলতঃ প্রমাণ দ্বারা প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হয় — একথাও আর বলা যাবে না।

পূর্বপক্ষীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রমাণের অপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠায় তৃতীয় কল্পটি হলো প্রমাণ প্রমেয়ের সমকালেও থাকতে পারে না —

"যুগপৎসিদ্ধৌ প্রত্যর্থনিয়তত্বাৎ ক্রমবৃত্তিত্বাভাবো বুদ্ধীনাম্।।"[১০]

বিষয়টি হলো যদি প্রমাণ ও প্রমেয় সমকালে অর্থাৎ একই সময়ে অবস্থান করে তাহলে গন্ধ, শব্দ প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞানগুলি একই কালে উৎপন্ন হওয়ায় এই জ্ঞানগুলির ক্ষেত্রে কোন ক্রম স্বীকার করা যায় না। কিন্তু একই সময়ে যে গন্ধ প্রত্যক্ষ, শব্দ প্রত্যক্ষ হতে পারে না তা ন্যায়সিদ্ধান্ত। ন্যায়দর্শনে যেকোন ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সন্নিকর্ষকে একটি আবশ্যক শর্তরূপে স্বীকার করা হয়েছে এবং মন অনুপরিমাণ হওয়ায় সে কোন এক ক্ষণে একটি ইন্দ্রিয়ের সাথেই যুক্ত হতে পারে। অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধ প্রত্যক্ষকালে মন যখন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত থাকে তখন সে চক্ষুইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত থাকতে পারে না। অতএব গন্ধ প্রত্যক্ষকালে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ অসম্ভব। অতএব, গন্ধাদি প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞানগুলি একইকালে উৎপন্ন হয় না — কালভেদে ক্রমশঃই উৎপন্ন হয়, একথা সর্বস্বীকৃত। কিন্তু প্রমাণও প্রমেয় সমকালবর্তী হলে ঐ জ্ঞানগুলির যৌগপদ্য স্বীকৃত হওয়ায়, ক্রমিকত্ব না থাকায় দৃষ্ট ব্যাঘাত দোষ উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ গন্ধাদি জ্ঞানগুলি 'প্রত্যর্থনিয়ত' অর্থাৎ জ্ঞান সর্বদা নিজ বিষয়ে নিয়ত বা নিয়মবদ্ধ হয়ে থাকে। এখন যদি প্রমাণের সাথে একই কালে প্রমেয় থাকে। তাহলে যেখানে গন্ধ পদার্থে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ আছে ও রূপ পদার্থে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ আছে সেখানে উভয় প্রমাণই থাকায় ঐ সমকালেই গন্ধ ও রূপ উভয়েই প্রমেয়রূপে আছে বলতে হবে এবং তদনুসারে একই কালে গন্ধ বিষয়ক প্রত্যক্ষ ও রূপবিষয়ক প্রত্যক্ষ এই উভয়জ্ঞানই আছে — একথাও স্বীকার করতে হবে, যেহেতু প্রমাণজন্য প্রমাজ্ঞানের বিষয়ই প্রমেয় পদবাচ্য। অতএব, প্রমাণের সমকালেই প্রমেয় আছে বলার অর্থই ঐ প্রমেয় বিষয়ে প্রমাজ্ঞানও সেই কালে আছে। সুতরাং জ্ঞানগুলি প্রত্যর্থনিয়ত এবং সেক্ষেত্রে গন্ধাদি প্রত্যক্ষের যৌগপদ্য স্বীকৃত এবং মনের অতিসূক্ষ্মতা বিষয়ে যে ন্যায়সিদ্ধান্ত তাও অস্বীকৃত হবে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রমুখ নব্যনৈয়ায়িকগণ অবশ্য সামান্য স্বতন্ত্রভাবে মহর্ষি উল্লিখিত পূর্বপক্ষীয় আপত্তিটি ব্যাখ্যা করেছেন। জ্ঞানগুলি একটি বিশেষ অর্থ বা বিষয়ে নিয়ত বা নিয়মবদ্ধ হওয়ায় জ্ঞানের বিষয় যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ তা নিঃসন্দেহে বলা যায় — অতএব জ্ঞানের ক্রমবৃত্তিত্বই স্বীকার্য্য। কিন্তু যদি প্রমা ও প্রমাণ একই কালে থাকে তাহলে কিন্তু ক্রমবৃত্তিত্ব স্বীকার করা যাবে না। বিষয়টি দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে বলা যায়, ধরা যাক পদজ্ঞানরূপ প্রমাণ শব্দ বিষয়ক প্রত্যক্ষ এবং তার দ্বারা উৎপন্ন শাব্দবোধরূপ প্রমাজ্ঞান পদার্থ বিষয়ক ও পরোক্ষ। এই যে বিজাতীয় প্রমা ও প্রমাণ জ্ঞান — এদের যৌগপদ্য সম্ভব নয় এবং এরা বস্তুতঃ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ। পদজ্ঞানের পরেই শাব্দবোধ উৎপন্ন হয় ফলে এদের যৌগপদ্য হতেই পারে না। একই আপত্তি যে কোন প্রমাণ ও প্রমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কারণ প্রমার করণ বা অসাধারণ কারণই প্রমাণ। কিন্তু উভয়ের সমকালবর্তীতা স্বীকারে যৌগপদ্যের আপত্তি হয়।

সুতরাং প্রমাণ যখন প্রমেয়ের পূর্বকাল, উত্তরকাল ও সমকাল, কোন কালেই থাকে না বা কোন কালেই প্রমেয় পদার্থ প্রতিপাদন করে না, অতএব প্রমাণের প্রামাণ্য সম্ভব নয়। এইভাবে মহর্ষি ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হেতুর দ্বারা প্রমাণের অপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এরপর মহর্ষি উত্তরপক্ষ অবলম্বন করে পূর্বপক্ষের মত খণ্ডন করে প্রমাণ যে সৎ বা প্রামাণ্যসহ তা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন।

ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ প্রমাণের প্রামাণ্য নেই — পূর্বপক্ষীয় এই মতটি অনুমানের আকারে প্রকাশ করে বলা যায় —

"প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ অপ্রমাণ্য, যেহেতু তাতে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি আছে।"

সিদ্ধান্তীর মত অনুসারে এই 'ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি' হেতুটি অসিদ্ধ কারণ তা প্রমাণে নেই। ফলে এক্ষেত্রে হেত্বাভাস ঘটায় সাধ্য সাধন কখনোই সম্ভব হয় না অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। কিন্তু কিভাবে বলা যাবে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হেতুটি প্রমাণে নেই। এ প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ণ বলেছেন যে প্রমাণের অর্থাৎ যথার্থ উপলব্ধির সাধন এবং প্রমেয় হল যথার্থ উপলব্ধির বিষয় — এই উভয়ের পূর্বাপর সহভাবের কোন নিয়ম নেই। এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে উপলব্ধির হেতুরূপ প্রমাণ উপলব্ধির বিষয়রূপ প্রমেয়ের পূর্বে থাকে, আবার কিছু ক্ষেত্রে প্রমাণ প্রমেয়ের পরবর্তীকালে থাকে, আবার কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে তারা সমকালে থাকে। সুতরাং প্রমাণের অপ্রামাণ্য রূপ সাধ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হেতুরূপে যে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি গৃহীত হয়েছে তা অসিদ্ধ।

প্রমাণে প্রমেয়ের পূর্বকালবর্তিতা প্রতিষ্ঠা করে বাৎস্যায়ন বলেছেন —

"কচিদুপলব্ধিহেতুঃ পূর্বং পশ্চাদুপলব্ধিবিষয়ঃ।"[১১]

অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে উপলব্ধির হেতু পূর্বে থেকে পশ্চাতে অবস্থিত উপলব্ধির বিষয়কে প্রতিপাদন করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় সূর্য্যের আলোয় যখন কোন জ্ঞানলাভ করা হয় তা পরজাত-যেহেতু সূর্য্যের আলো পূর্বসিদ্ধ কারণ জগৎসৃষ্টির পূর্ব থেকেই সূর্য্য আছে। এক্ষেত্রে সূর্য্যের আলো উপলব্ধির হেতু হওয়ায় তা প্রমাণ ও পরে উৎপন্ন পদার্থটি উপলব্ধির বিষয় হওয়ায় প্রমেয়। এক্ষেত্রে প্রমাণে প্রমেয়ের পূ□র্বকালবর্তীতা বর্তমান। আবার প্রমাণ প্রমেয়ের পশ্চাতে থেকেও পদার্থ প্রতিপাদন করতে পারে। যেমন প্রদীপ তার পূ□র্ব থেকেই অবস্থিত ঘ টাদি পদার্থের উপলব্ধির সাধন হয়, আবার জ্ঞানমান ধূমও তার সমকালীন বহ্নির উপলব্ধির সাধন হতে পারে। সুতরাং উপলব্ধির সাধন পদার্থ ও উপলব্ধির বিষয়ের মধ্যে এমন কোন নিয়ম নেই যে তা একান্তভাবেই পূর্বকালবর্তী, পরকালবর্তী বা সমকালবর্তী হবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা বিশেষ বিশেষ হয়। অতএব পূর্বপক্ষী যে সামান্যতঃ প্রমাণে প্রমেয়ের ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিবশতঃ প্রমাণের প্রামাণ্য অস্বীকার করেছেন তা স্বীকার করা যায় না। মহর্ষি গৌতম স্বয়ং সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন যে প্রমাণ প্রমেয়ের পরে থেকেও পদার্থ প্রতিপাদন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে ন্যায়দর্শনে বলা হয়েছে—

"ত্রৈকাল্যাপ্রতিষেধশ্চ শব্দাসাত্যেদ্যসিদ্ধিবৎ তৎসিদ্ধেঃ।"[১২]

অর্থাৎ শব্দ থেকে যে আতোদ্যসিদ্ধি হয় তার দ্বারাই সিদ্ধ হয় পূর্বসিদ্ধ প্রমেয়ের জ্ঞান পশ্চাৎসিদ্ধ প্রমাণ দ্বারা সম্ভব। ব্যাখ্যা করে বলা যায়, কোন ব্যক্তি যদি আমাদের প্রত্যক্ষের অগোচরে দূরবর্তী কোন স্থানে বসে মৃদঙ্গ বা বীণাজাতীয় বাদ্যযন্□ বাজান তাহলেও শুধুমাত্র তাদের শব্দের ভিত্তিতে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি তা মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্□র শব্দ। এক্ষেত্রে উপলব্ধির সাধনরূপ যে শব্দ প্রমাণ তা পশ্চাৎসিদ্ধ এবং উপলব্দির বিষয়রূপ মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্□ হল পূ□র্বসিদ্ধ। কেননা, মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্□ থেকে উৎপন্ন শব্দের পূর্বে যদি মৃদঙ্গাদি বস্তুটি উপস্থিত না হয়, তাহলে ঐ শব্দটিকে 'মৃদঙ্গাদির শব্দ' রূপে অভিহিত করা যেত না। অতএব, এক্ষেত্রে প্রমাণ প্রমেয়ের পরবর্তীকালে থেকেও পদার্থ প্রতিপাদন করতে পারে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আপত্তি হতে পারে যে শব্দ বিশেষ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ায় তা শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়েই থাকে। তার সাথে বীণাদি বাদ্যযন্□র কোন সম্বন্ধ না থাকায় কিভাবে শব্দ বিশেষ থেকে বীনাদি বাদ্যযন্□র অনুমান সম্ভব বোঝা যায় না। ভাষ্যকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'মৃদঙ্গ বাজছে', 'বীণা বাজছে' ইত্যাদি শব্দ বিশেষের দ্বারাই বীণা বাদ্যযন্□র অনুমান করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, 'বীণা বাজছে' — এই জাতীয় শব্দের অসাধারণ ধর্ম হল 'বীণা-নিমিত্ত-কর্তৃ'। যে অসাধারণ ধর্মের ভিত্তিতেই অনুভব করা সম্ভব যে, শ্রবণলব্ধ শব্দটি বীণার শব্দ এবং তার দ্বারাই বীণার অনুমান হয় (অবশ্যই যে ব্যক্তি বীণা □বনির বিশেষ ধর্ম বা অসাধারণ ধর্ম জানেন তার পক্ষেই এই অনুমান সম্ভব)।

পূর্বপক্ষীয় মতকে সমূলে বিনষ্ট করার নিমিত্ত ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন যে প্রতিষেধ বাক্যের দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রামাণ্য

অস্বীকার করা হয়েছে সেই বাক্যটিকেই সর্বতোভাবে খণ্ডন করেছেন। বক্তব্য হল এই যে পূ□র্বপক্ষী প্রতিষেধ বাক্যে ঘোষণা করেছেন প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নেই, তার দ্বারা হয় তারা প্রত্যক্ষাদির সত্তাকে নিবৃত্ত করেছেন অথবা প্রত্যক্ষাদির অসত্তা প্রতিষ্ঠা করছেন। প্রথম কল্পে যদি প্রত্যক্ষাদির সত্তাকে নিবারণ করতে হয় তাহলে পূর্বে তাকে স্বীকার করতে হবে, কেননা যা অসৎ তাকে কখনো নিবৃত্ত করা যায় না — অতএব প্রকারন্তরে প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকারই করা হল। অন্যদিকে দ্বিতীয় কল্পে যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সিদ্ধ অসত্তাকে জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে তাহলেও ঐ অসত্তাকে সিদ্ধ পদার্থরূপে স্বীকার করতে হবে এবং বাক্যটিতে সেক্ষেত্রে প্রমাণের লক্ষণ প্রযুক্ত হবে। ব্যাখ্যা করে বলা যায় — উপলব্ধির হেতুই প্রমাণ। এখন যদি ঐ প্রতিষেধবাক্যটি প্রমাণের অসত্তার জ্ঞাপক তথা উপলব্ধির হেতু হয় তাহলে তাকেও প্রমাণ রূপে গণ্য করতে হবে এবং প্রমাণের প্রামাণ্যের অসম্ভাব্যতা প্রতিপাদনের জন্য প্রমাণবাক্যেরই সাহায্য নেওয়া হয় তখন প্রমাণ নেই এমন আর বলা যায় না —

"অথাসম্ভবো জ্ঞাপ্যতে প্রমাণলক্ষণং প্রাপ্তস্তর্হি প্রতিষেধঃ,

প্রমাণাসম্ভবস্যোপলব্ধিহেতুত্বাদিতি।"[১৩]

মহর্ষি গৌতম স্বয়ং 'প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার্য্য নয়' — এই পূর্বপক্ষীয় আশংকার এক অভিনব সমাধান প্রদর্শন করেছেন। তিনি 'প্রমাণ পরীক্ষা' প্রসঙ্গে পূর্বপক্ষরূপে যে হেতুবাক্যের দ্বারা প্রমাণে প্রামাণ্যের অভাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সমাধানে সেই বাক্যটিতেই দোষ প্রদর্শন করে বাক্যটির অসাধকত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। উদ্দ্যোতকরও ন্যায়বার্তিকে মহর্ষির এই উত্তরপক্ষটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচ্য প্রতিষেধকবাক্যটিকে স্বচনব্যাঘাতদোষদুষ্ট বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, যা কোন কালেই পদার্থ সাধন করে না, তা অসাধক — এই মতানুসারে প্রতিষেধবাক্যটিও অসাধকে পরিণত হয় যেহেতু তাও কোনকালে প্রতিষেধসাধন করে না। অতএব সেটিও ত্রৈকাল্যাসিদ্ধ হওয়ায় তারও প্রামাণ্য নেই। তাৎপর্য্য হল কোন বিষয়কে সিদ্ধ হতে হলে অবশ্যই হেতুপূর্বক হতে হবে কারণ ঐ হেতুর দ্বারাই সাধ্যসিদ্ধি হবে — কিন্তু সেই হেতুটি যদি সাধ্যের পূর্বকাল, উত্তরকাল বা সমকাল কোন কালেই থেকে সাধ্য সাধনে অক্ষম হয় তাহলে সেই হেতুর দ্বারা ঐ সাধ্য সিদ্ধি হতে পারে না।

এখন দেখা যাক কি ভাবে পূর্বপক্ষীয় প্রতিষেধ বাক্যটি সাধ্য সাধনে অক্ষম হয়। যে বাক্যের দ্বারা কোন পদার্থের অভাব জ্ঞাপন করা হয় সেই বাক্যটিকে ঐ বিষয়ের প্রতিষেধ বলা যায়। আলোচ্য স্থলে, প্রতিষেধ বাক্যটি হল "ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি হেতুক প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নেই" — অর্থাৎ প্রমাণ এক্ষেত্রে প্রতিষেধ্য। প্রশ্ন হলো এই প্রতিষেধ বাক্যটি প্রতিষেধ্যের কোন কালে থাকে ? পূর্বকাল, উত্তরকাল অথবা সমকাল। যদি বাক্যটি পূর্ব থেকেই সিদ্ধ থাকে অর্থাৎ পূর্ব থেকেই যদি জানা থাকে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নেই তাহলে বাক্যটির প্রতিষেধ্য (প্রামাণ্য) তার অস্তিত্ব না থাকায় বা তা অলীক হওয়ায় তার কিভাবে প্রতিষেধ হবে বোঝা যায় না। দ্বিতীয়তঃ যদি বলা হয় প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য পূর্বে ছিল,পরে প্রতিষেধ বাক্যটি তার প্রতিষেধ করে, তাহলেও প্রতিষেধ্য সিদ্ধ হয় না কেননা যার প্রামাণ্য পূ□র্বসিদ্ধ তা কিভাবে প্রতিষেধ্য হবে ? প্রতিষেধ বাক্য ও প্রতিষেধ্য পদার্থ একই সময়ে সিদ্ধ হবার অর্থ প্রতিষেধ্য সিদ্ধি প্রতিষেধ বাক্যের ওপর নির্ভরশীল নয় অর্থাৎ প্রতিষেধ্য বাক্য আর হেতু না থাকায় তা নিরর্থক হয়ে পড়ে। সুতরাং প্রতিষেধ বাক্যটিও প্রতিষেধ্যে কোন কালেই থাকে না এবং তাকে স্বীকারও করা যায় না। অতএব প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য অসিদ্ধির ক্ষেত্রে ঐ প্রতিষেধবাক্য অগ্রাহ্য হওয়ায় প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য সিদ্ধই থাকে।

পূর্বপক্ষীয় সিদ্ধান্ত প্রমাণের অপ্রামাণ্য সাধন প্রসঙ্গে মহর্ষি দ্বিতীয় একটি সমাধানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন —

"স□র্বপ্রমাণ-প্রতিষেধাচ্চ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ।"[১৪]

অর্থাৎ সর্বপ্রমাণের প্রতিষেধবশতঃ প্রতিষেধের উপপত্তি হয় না। অন্যভাবে বলা যায়, যদি কোন প্রমাণই স্বীকার করা না হয়, তাহলে প্রত্যক্ষাদির প্রামাণ্য নেই — এই প্রতিষেধেরও উপপত্তি সম্ভব নয়। বাৎস্যায়ন অনুসরণে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলা যায়। পূর্বপক্ষী যে প্রত্যক্ষাদির অপ্রামাণ্য সাধন প্রসঙ্গে 'ত্রৈকাল্যাসিদ্ধি' কে হেতুরূপে গ্রহণ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অতএব যত্র যত্র হেতু,

তত্র তত্র সাধ্য — এই নিয়ম অনুসারে ঐ হেতুটি যেখানে যেখানে আছে, সেখানেই যে অপ্রামাণ্য আছে তা বোঝানোর জন্য দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ প্রদর্শন করতে হবে। ঐ উদাহরণ বাক্যে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় সেই দৃষ্টান্ত পদার্থের হেতু পদার্থের সাধ্যসাধকত্ব বোঝা যায়। ঐ উদাহরণবাক্য প্রত্যক্ষ প্রমাণমূলক হওয়ায় পূর্বপক্ষী যখনই হেতুবাক্যের পর উদাহরণ বাক্য প্রয়োগ করলেন তখনই যে তিনি প্রত্যক্ষপ্রমাণ স্বীকার করলেন তাতে সন্দেহ নেই। এইভাবে পূর্বপক্ষীকে অনুমান ইত্যাদি প্রমাণও স্বীকার করতে হবে যেহেতু সাধ্যসাধনের জন্য তাকে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ অবয়বকেই প্রয়োগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে তার প্রযুক্ত ত্রৈকাল্যাসিদ্ধিরূপ হেতুটি বিরুদ্ধ হেত্বাভাসে দুষ্ট হবে।

অবশ্য পূর্বপক্ষী উপরোক্ত আপত্তি খণ্ডন করে বলতেই পারেন যে তিনি তাঁর প্রস্তাবিত বাক্য — "প্রত্যক্ষাদীনামপ্রামাণ্যং ত্রৈকাল্যাসিদ্ধেঃ" — যার দ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অপ্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই বাক্যটির ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব জন্য যে মূল প্রমাণগুলি মানা প্রয়োজন, প্রয়োগের অবিচারিতসিদ্ধ সেই প্রমাণ স্বীকার করেই অন্যের প্রামাণ্য খণ্ডন করবেন। মহর্ষি এই সম্ভাব্য উত্তরটিও খণ্ডন করে প্রমাণের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রথমতঃ যদি পূর্বপক্ষী নিজ বাক্য প্রয়োগের জন্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ স্বীকার করেন তাহলে তিনি আর সর্বপ্রমাণ প্রতিষেধের প্রস্তাব করতে পারবেন না। দ্বিতীয়তঃ 'অবিচারিত সিদ্ধ' বলতে প্রকৃতপক্ষে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয়, যা বিচারের সাহায্যে প্রমাণিত নয়, লোকপ্রসিদ্ধ বা সর্বজন স্বীকৃত তাকে অবিচারিত সিদ্ধ বলা হলে, এমন পদার্থ দ্বারা সে অন্যের প্রামাণ্য অস্বীকার করা যায় না তা সহজেই বোধগম্য হয়। বরং সর্বজনসিদ্ধরূপে পূর্বপক্ষীও তা প্রয়োগ করায় সেগুলির প্রামাণ্যই বস্তুতঃ সিদ্ধ হয়।

এইভাবে প্রমাণশাস্□ রূপে পরিচিত ন্যায়দর্শনে পূ□র্বপক্ষীয় সম্ভাব্য আশংকা সমূহ পরিহারপূর্বক প্রমাণের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠাপূর্বক প্রমাণ পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

সূত্র নির্দেশিকা:

১. ন্যায়সূত্র, মহর্ষি গৌতম — ১/১/১।
২. ন্যায়সূত্র, মহর্ষি গৌতম — ১/১/৩ সূত্রভাষ্য।
৩. ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র), বাৎস্যায়ন ভাষ্য — সূচনা ভাষ্য।
৪. অনুমান চিন্তামনিঃ দীধিতি, পৃ. ১১৩।
৫. ন্যায়কন্দলী, পৃ. ২৬।
৬. ন্যায়সূত্র, মহর্ষি গৌতম — ২/১/৮/৬৯।
৭. ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র), বাৎস্যায়ন ভাষ্য — ২/১//৯//৭০।
৮. ন্যায়সূত্র, মহর্ষি গৌতম — ১/১/৪।
৯. ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র), বাৎস্যায়ন ভাষ্য — ২/১/১০/৭১।
১০. ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র), বাৎস্যায়ন ভাষ্য — ২/১/১১//৭২।
১১. ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র), বাৎস্যায়ন ভাষ্য, দ্বিতীয় খণ্ড — ২/১/১১ — সূত্র ভাষ্য।
১২. ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র), বাৎস্যায়ন ভাষ্য — ২/১/১৫/৭৬।
১৩. ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র), বাৎস্যায়ন ভাষ্য — ২/১/১১ —সূত্র ভাষ্য।
১৪. ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র), বাৎস্যায়ন ভাষ্য — ২/১/১৩/৭৪।